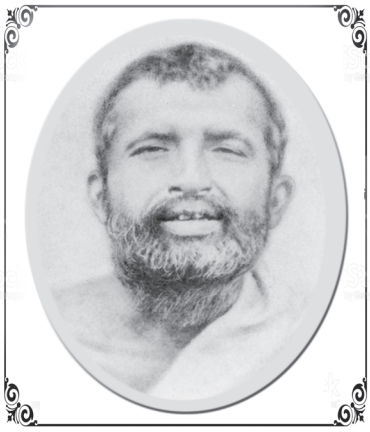

ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রব্রাজিকা সত্যময়প্রাণা

‘‘চল ভাই, তাঁকে দর্শন করিতে যাই। সেই মহাপুরুষকে, সেই বালককে দেখিব, যিনি মা বই আর কিছু জানেন না; যিনি আমাদের জন্য দেহধারণ করে এসেছেন—তিনি বলে দেবেন, কি করে এই কঠিন জীবন-সমস্যা পূরণ করতে হবে! সন্ন্যাসীকে বলে দেবেন, গৃহীকে বলে দেবেন! অবারিত দ্বার! দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। চল, চল, তাঁকে দেখব।’’

ভক্ত ভগবানকে ডাকবেন, ভগবান ভক্তের ডাকে সাড়া দেবেন—এ-সত্য ভারতবর্ষে কে না জানে? একটি দিন যায়, আর একটি নতুন প্রভাত আসে। এইভাবে যুগের পর যুগ আসে এবং যায়। প্রতি যুগেই আদর্শের প্রয়োজন হয়, সে-প্রয়োজন মেটে এবং পরের যুগে তা বদলায়ও। অবতারের অবতরণ যুগপ্রয়োজনে। তাই তাঁর কার্যকলাপও যুগে যুগে নব নব। তবে প্রয়োজন যাই থাকুক, একটি বৈশিষ্ট্য সব যুগেই প্রত্যক্ষ করা গেছে—সেটি শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য। শ্রীরামচন্দ্র বলেছিলেন (বাল্মীকি রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড ১৮।৩৩),

‘‘সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥’’

—কেউ যদি আমার শরণাগত হয়ে একবার মাত্র বলে—‘আমি তোমার হলাম’, তবে সকল প্রাণী থেকে আমি তাকে অভয় দান করি—এই আমার ব্রত। যুদ্ধক্ষেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সংশয়ী অর্জুনকে শ্রীভগবান পরম মমতায় বুঝিয়েছেন কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ। চরম লক্ষ্য নির্দেশ করে বলেছেন, যাঁকে পেলে জগতের আর কোনও কিছুই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় না, যাঁকে লাভ করলে গুরুতর দুঃখ এসেও বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না, সেই ভগবানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। জীবনের যে-কোনও সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় নির্ধারণ করতে শিখিয়েছেন—যা-ই করো না কেন, সব আমাকে অর্পণ করো। তাতে যেমন শরণাগতি আসবে, তেমনই অহংকার মাথা তুলতে পারবে না। অথচ আমরা সেই রাজার মতো মন্দির নির্মাণ করে বসি—যেখানে শুধুই দম্ভ আর অহংকার। এত কাজ করলাম—এত জপ করলাম—এত দান করলাম—এ যেন নিজের অহং দিয়ে মিনার গড়া। তাই ভগবান সবচেয়ে কঠিন কাজটি সবচেয়ে সহজ করে বললেন—কিছু করতে হবে না, সব ধর্ম ছেড়ে শুধু আমার শরণ নাও, আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করব। এই শরণাগতি এলে মানুষের পরম কল্যাণ। তখন ভক্তের পৃথক সত্তার অনুভূতি থাকে

File Name : Mar 5

না। অর্জুনের এই শরণাগতি আনতে ভগবানকে বহু বাক্য ব্যয় করতে হয়েছে। কখনও তাঁর অজ্ঞান দূর করে সঠিক লক্ষ্যটি দেখাতে ভগবান ব্যঙ্গ হাসি হেসেছেন, কখনও বা জ্ঞানখড়্গ চালিয়েছেন। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই প্রবাহিত হয়েছে তাঁর করুণার শীতল বাতাস।

জীবের দুঃখে পাঁচশত বার জন্মানো যাঁর কাছে জল-ভাতের মতো সহজ, তিনি যে বলবেন—মেরেছিস কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না?—এর মধ্যে আর অভিনবত্ব কোথায়!

উপনিষদের ঋষিরা যুগযুগ ধরে কঠোর সাধনা করে পুরুষোত্তমকে লাভ করে অনুভব করেছেন জগতের আনন্দভরা মধুময়তা। এযুগে সবই আলাদা। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেতে ভক্তকে পাহাড়-পর্বত, বা বনে-জঙ্গলে যেতে হয়নি। পরম কারুণিক শিবই অতি দীনভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন জীবের দ্বারে। এসেও আক্ষেপ! চৈতন্যদেবের মতো বাড়ি বাড়ি ছুটে আসতে পারেন না, দুর্বল শরীরে গাড়ি চেপে আসতে হয় বলে। কখনও আপ্যায়ন দূর, আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকায় গৃহকর্তা হয়তো তাঁর আগমন-সংবাদটুকুও নেননি। এতে রাগ করে প্রস্থানোদ্যত শিষ্যকে নিরভিমান শ্রীভগবান বুঝিয়ে দেন, গৃহস্থেরা অজ্ঞানবশত অনেক সময় সাধুর সঙ্গে যথোচিত ব্যবহার করতে পারে না; তবু সাধু তাদের দোষ না দেখে কেবল কল্যাণচিন্তাই করবে। কিছু না খেয়ে এলে গৃহস্থের অমঙ্গল হবে, তাই হয়তো চেয়ে একগ্লাস জল খেয়ে ফিরে এসেছেন।

ভগবানের আশয় পরিস্ফুট হয়েছে এই গানটিতে : ''ভক্তের কাঙাল আমি চিরকাল/ ভক্ত আমার প্রাণের প্রাণ।/... ভক্তের কারণে আসি এ ভুবনে...।'' ভক্তের জন্যই তাঁর মর্ত্যতনু ধারণ, ভক্ত তাঁর প্রাণ। তাই তাদের কাঁদবার অবসর না দিয়ে নিজেই কেঁদে আকুল। ''ওরে...দিন যে যায় রে—তুই ভগবান লাভ করবি কবে?...আমি যে তাই ভেবে আকুল।'' কিশোর নিরঞ্জনের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। তিনি কিছুতেই ভেবে পান না, আমার ভগবান লাভ হচ্ছে না বলে, দিন চলে যাচ্ছে বলে এঁর এত আর্তি কেন? সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেন পরের জন্য এ কী অহৈতুকী ভালবাসা! দেহেমনে তরতাজা কিশোরটি চাকচিক্যময় জগতের হাতছানিতে সেদিন ভেসে যাননি। কারণ তাঁর মূলধন ছিল বহু জন্মের তপস্যালব্ধ সরলতা। তাই শ্রীভগবান তাঁকে চিরজীবনের জন্য আপন করে নিয়েছিলেন। সে-ভালবাসায় বাঁধা পড়ে অকপট ভাষায় তিনি জানিয়েছেন, ''আগে ভালবাসা ছিল বটে, কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার জো নাই।''

এযুগে শ্রীভগবানের সাধারণ বেশে অসাধারণ সব ক্রিয়াকলাপ। ''দাঁড়াও আমার আঁখির আগে.../ যাহা কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া,/ ভুবন ছাপিয়া, জীবন ব্যাপিয়া দাঁড়াও হে...''—এ-প্রার্থনা ভক্তকে করতে হয়নি। কারণ ভক্ত তখন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সব পণ্ডিতদের দর্শন গুলে খাওয়া ইউনিভার্সিটির বুদ্ধিমান উজ্জ্বল ছাত্র। তাই আচার্যদেবের মুখে 'ঘটিটা ঈশ্বর বাটিটা ঈশ্বর, যা কিছু দেখছি এবং আমরা সকলেই ঈশ্বর' এই চরম অদ্বৈতবেদান্ত শুনে বাইরে এসে ব্যঙ্গ করে উচ্চহাসিতে গগন বিদীর্ণ করছিলেন। স্পর্শমাত্র তাঁকে সেই মুহূর্তে অদ্বৈতবোধে আরূঢ় করতে দুবার ভাবেননি দয়াল প্রভু। ঈশ্বরকোটি ভক্তটিও সে-অনুভূতি লাভ করে পথ-ঘাট-গৃহ-অন্ন-থাল-হাতা-পরিবেশক—সব ঈশ্বরময় দেখে বেহেড হননি, বা আর অন্যের মতো 'আপনার ভাব ফিরিয়ে নিন' বলে আর্তিও জানাননি। ধন্য প্রভু! ধন্য ভক্ত! ধন্য উত্তরকাল! যে-কাল ঈশ্বরকোটি ভক্তের উচ্চ অনুভূতির আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায়।

সংসারবিরক্ত শিষ্য ত্যাগের পথ অবলম্বন করবেন—এ-সংবাদে গুরুদেবের চোখের কোণ

দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়াবার কথা। গড়ায়নি। কারণ তিনি যে নরসিংহ অবতারে পরম স্নেহে ভক্তের গা চাটেন। তাই তাঁর প্রেমগঙ্গায় আকস্মিক জোয়ার : ''কথা কহিতে ডরাই না কহিতেও ডরাই/ (আমার) মনে সন্দ হয় বুঝি তোমায় হারাই, হা—রাই!'' শুধু তাই নয়, সকলের অগোচরে মায়ের মমতা নিয়ে কাছে এসে মিনতি করেন—''আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্য থাক।'' পিছন থেকে অতীত এবং সামনে থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব ভেসে গিয়েছে ভক্তের। অনুভব করেছেন, ''একা ঠাকুরই কেবল আমাকে প্রথম দেখা থেকে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করে এসেছেন, আর কেউই নয়—নিজের মা-ভাইরাও নয়। তাঁর ঐরূপ বিশ্বাস ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মতো বেঁধে ফেলেছে। একা তিনিই ভালবাসতে জানতেন ও পারতেন।'' শ্রীরামকৃষ্ণ ভালবেসে ভালবাসতে শেখালেন, কেঁদে কাঁদতে শেখালেন, ডেকে ডাকতে শেখালেন।

সামান্য হাসি ঠাট্টা রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে, দৈনন্দিন তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যবহার ও ঘটনার মধ্য দিয়ে কী গভীর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করে দিয়ে গিয়েছেন তিনি! নিজের সর্বস্ব দিয়ে প্রেমের বিনিময়ে ভক্তের অমূল্য হৃদয়টি কিনে নিয়েছেন চিরকালের জন্য। ভক্তের সে-প্রস্ফুটিত হৃদয়কুসুমের সৌরভ বাক্যতনু ধারণ করেছে—'দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে'। প্রাণের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন : ''আমার দেখা পবিত্রতম ব্যক্তি তিনি... তিনি আমাকে এত ভালবাসেন, সে ভালবাসার শক্তি আমার বাপ মায়েরও নেই।''

বাবা-মায়ের ভালবাসা কোথায় যেন মলিন হয়ে যায়, যখন ছোট ছোট ছেলেগুলিকে তিনি হাওয়া করে ঘুম পাড়ান বা নিজের মশারির ভেতর টেনে নিয়ে শোয়ান, বা কারও উচ্চাবস্থা দেখে আনন্দে বলেন—রাখালের যা অবস্থা, আমাকেই তাকে জল দিতে হয়। গর্ভধারিণীর চোখের জলে ভুলে নিজের মনের বৈরাগ্যের রংটিকে মূল্য না দিয়ে বিবাহ করেছেন কোমলপ্রাণ যোগীন্দ্রনাথ। পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেছেন গর্ভধারিণীরই তিরস্কার : ''ভেতরে ইচ্ছা না হলে, তুই আমার জন্য বে করেছিস—এ কি সম্ভব?'' জননীর বাক্যে জগতের প্রকৃত রূপটি দর্শন করে দগ্ধ মন নিয়ে যে-মুহূর্তে তিনি চোখের জলে ভেসে সব অন্ধকার দেখেছেন, তখনই সত্যস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তকে ডেকে নিয়েছেন নিজের কাছে। জানিয়েছেন, ''এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না।'' ভক্ত হৃদয়ঙ্গম করেছেন সত্যকে—এ-সংসারে মন ও মুখে মিল থাকা একমাত্র ঠাকুর ভিন্ন আর কারও নেই।

ভক্তকে কৃপারও কত বৈচিত্র্য ভগবানের! কখনও কোনও গৃহভৃত্যকে সামান্য সামান্য কাজ করিয়ে সাধনশক্তির উৎসমুখ খুলে দিয়ে তাঁকে করে তুলেছেন অন্তর্মুখ সাধক। কখনও কোনও মাতৃহারা তরুণ দক্ষিণেশ্বরের ঘরে ছোট খাটটিতে বসা মানুষটির কোলে মুখ রেখে ফিরে পেয়েছেন শৈশবে হারানো গর্ভধারিণীকে। সে-মাতৃস্পর্শে তিনি হয়ে উঠেছেন প্রকৃত মহাপুরুষ। আবার কখনও, দরিদ্র ভক্ত এক পয়সার সন্দেশ বা বাতাসা এনে যখন সসংকোচে এককোণে রেখে দিয়েছেন, প্রাণের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও সকলের সামনে হাতে তুলে দিতে পারেননি, তখন শ্রীভগবান সমাধি থেকে উঠে অন্য সকল মহার্ঘ্য বস্তু ছেড়ে সেই সন্দেশই পরম তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। সবক্ষেত্রেই শ্রীভগবানের বাৎসল্যের বিগলিত জাহ্নবীধারায় সিঞ্চিত হয়েছে ভক্তপ্রাণ।

দক্ষিণেশ্বরে ঘরের চারটি দরজাই খোলা ভক্তের জন্য। তিনি অপেক্ষায় থাকেন। সে-দরজা দিয়ে কখনও এসেছেন তমঃপূর্ণ কলকাতার সেরা সত্ত্বগুণী, কখনও এসেছেন এমন পাপ নেই যা

করেননি এহেন মাতাল। ভগবানের অসীম করুণা-সমুদ্রের ঢেউয়ে সকলেই ভেসে গিয়েছেন। পাপের রং ফিকে হয়ে পাকা হয়েছে বিশ্বাসের রং। ভগবানের প্রতি পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস নিয়ে ভক্ত হয়ে উঠেছেন ভক্ত ভৈরব।

ঈশ্বরকোটি ভক্ত পূর্ণচন্দ্র। তাঁকে প্রথম দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ অলৌকিক আনন্দে বিভোর। দরদর ধারে আনন্দাশ্রুতে গাল দুটি ক্রমশ ভিজেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কত শত দিকে তাঁকে খেয়াল রাখতে হয়। তবু কী সূক্ষ্ম তাঁর দৃষ্টি! ভক্তের চিবুক ধরে মাতৃস্নেহে বলতে ভোলেন না, ''তোর যখন সুবিধা হবে চলে আসবি—গাড়ি ভাড়া এখান থেকে নিবি।'' 'সা চাতুরী চাতুরী' জানা ভক্তও কি কম চতুর? সরল চিত্তে জানায় : ''আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্য।'' ভগবান সন্তোষ প্রকাশ করেন : ''আমার উপর খুব টান!'' বুঝিয়ে দেন এই টানটুকু এলে জগতে আর কিছুরই প্রয়োজন থাকে না। বিষয়-মধু, কামনা-কুসুম আপনা থেকেই তুচ্ছ হয়ে ভক্ত হয়ে যান পূর্ণ পবিত্র। এ-উপলব্ধি কবির ভাষায় : ''যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্তে কিছু তব নাই/ তুমি তাই পবিত্র সদাই।''

আমরা তাঁকে দেখার আয়োজন করি 'ফুলের মালা, দীপের আলো, ধূপের ধোঁয়া'-য় আর 'স্তবের বাণীর আড়াল টেনে'। নৈবেদ্য সাজাই শুকনো আলোচাল আর কতকগুলি ফল-মিষ্টিতে। সেখানে অজীর্ণরোগে আক্রান্ত ভক্ত দীর্ঘদিন আসতে পারেননি জেনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কাছে ডেকে এনে নিজের পথ্যের ঝোলভাতের অগ্রভাগ সকাল সকাল খাইয়ে দেন। ভক্তের ওজর-আপত্তিতে তাঁকে বুঝিয়ে দেন, এ শুধু অজ্ঞানতাবশত জীবের ভেদবুদ্ধি। কারণ তিনি আর ভক্ত কি আলাদা? মনে পড়ে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সমরে নিষ্ঠুরতা দেখালেও জননীর চিত্তের কৃপায় কোথাও ভাঁটা পড়েনি। ভক্তকে পরম সত্যটি জানিয়েছেন কত অনায়াসে! ''একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা''—জগতে আমি ছাড়া আর কে আছে?

এতদিন ভক্ত ভগবানকে মাল্যচন্দনে সাজিয়ে, নৈবেদ্য নিবেদন করে অর্চনা করে এসেছেন। আজ শ্রীভগবানই মাল্য-চন্দনে ভূষিত করে পূর্ণচন্দ্রকে খাওয়ানোর আদেশ দেন। শুধু আদেশ নয়, কোন তরকারি বেশি করে দিতে হবে তারও তদারকি করে যান। খাওয়ার পরে হাতমুখ ধোয়ার জল এবং শেষে ষোলো আনা দক্ষিণা। আবার কখনও নিজের হাতে খাইয়ে দিয়ে জানতে চান : ''আমাকে তোর কি মনে হয়, বল দেখি?'' বহু জন্মের সুকৃতিবলে অপূর্ব বিশ্বাসে ভক্ত উত্তর দিয়েছে, ''আপনি ভগবান—সাক্ষাৎ ঈশ্বর!'' শুধু কি যখন কাছে এসেছেন তখনই দেখেছেন ভক্তকে? না। বহু বছর বাদে, যখন শ্রীরামকৃষ্ণ আর স্থূলদেহে নেই, সেইসময় মুমূর্ষু পূর্ণ রোগশয্যা থেকে উঠে দুর্বল শরীরে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতেই শ্রীরামকৃষ্ণ হাত ধরে এনে পরম মমতায় বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গিয়েছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি সঙ্গেই আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত অধরলাল সেনের গৃহে উপস্থিত হয়েছেন। অধর জানিয়েছেন, ''আপনি অনেকদিন আসেননি।... আজ ডেকেছিলাম... চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।'' শুনে প্রসন্ন হয়ে ঠাকুর হাস্যমুখে উত্তর দিয়েছেন, ''বল কি গো!'' আধুনিক যুগ প্রমাণ চায়। তাই তিনি প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছেন, এইটুকু আন্তরিক চোখের জল ফেললেই তিনি আসেন। স্পর্শ করেন, কথা বলেন। নিজের বুদ্ধিবিবেচনায় অতিমাত্রায় নির্ভর করে যখন ভক্ত জীবনসমস্যার সমাধান খুঁজে না পেয়ে মৃত্যুতে সমাধান খুঁজেছেন, তখনই শুনেছেন, বাঁদরছানা তার মাকে আঁকড়ে ধরলে তবে সে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে, কিন্তু বিড়ালছানা তা নয়। মা তাকে যেখানে রাখে সেইখানেই সে

ম্যাও ম্যাও করে মাকে ডাকে। মা তার সব প্রয়োজন মেটায় তা বলাই বাহুল্য। দিশা খুঁজে পেয়েছেন ভক্ত। পরীক্ষা করে সে-সত্য যাচাইও করে নিয়েছেন। পুজো করতে বসে ভেবেছেন, ধ্যানের সময় যদি তিনি আসেন তাহলে জানব তিনি অবতার। তিনি যে কানখড়কে! পিঁপড়ের পায়ের নূপুরের ধ্বনি শুনতে পান! তাই, ''কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিবারে পান/ ভবনে হাজির তাঁর প্রভু ভগবান।'' একবার নয় পর পর তিনবার। চোখের জলে এবং আত্মবিশ্লেষণে পূর্বসংস্কার ক্ষীণ হয়ে গিয়ে আনন্দসাগরে ভেসে গিয়েছেন ভক্ত।

এই বাৎসল্যের জোয়ারে বিষয়ী জমিদার মথুরানাথের বিষয়চিন্তা ভেসে গেছে। বৈরাগ্যের মহিমা উপলব্ধি করে ধন্য হয়েছেন তিনি। সহস্র মুদ্রা দিয়ে ক্রয় করে এক জোড়া বেনারসী শাল এনে শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন। ভগবানও ভক্তের আনন্দে আহ্লাদিত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন ঘরময়। পরক্ষণেই আসল সত্যটি জানিয়ে দিতে ভোলেননি। শালদুটি পঞ্চভূতের বিকার ছাড়া তো কিছু নয়, এ দিয়ে তো সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না; বরং অভিমান ক্রমে মনকে ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। যা কিছু ঈশ্বরলাভে বাধা দেয় তাকে কীভাবে ত্যাগ করতে হয় তা শিখিয়ে দিলেন ঠাকুর। শালদুটি মাটিতে ফেলে মুখামৃত ছিটিয়ে ধুলোয় ঘষতে লাগলেন। তাতেও শান্তি নেই—পোড়াবার উপক্রম করলেন। সেই বৈরাগ্যের তীব্র আঁচ তখন ভক্তও অনুভব করেছেন—''বাবা বেশ করেছেন।''

ভক্ত এক পা এগোলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। তাই ভক্তের মন যখন একটু প্রস্তুত হয়েছে তখনই ভক্তকে সমাধিসুখ আস্বাদন করিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আনন্দের সে-রেশটিকে ভক্ত ধরে রাখতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু জীবনের লক্ষ্যটি তখনই স্থির হয়ে গেছে। তাই রোগশয্যায় যখন চরণধূলার প্রার্থনা করেছেন, তখন পরীক্ষার ছলে ভগবান জানিয়েছেন : ''ওতে তোমার... কি আরোগ্য হবে?'' ভক্তও মনের কথা সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, ''তোমার পায়ের ধুলা কি... আরাম করবার জন্য চাচ্ছি? তার জন্য তো ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হবার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধুলা চাচ্ছি।'' অতঃ কিম্? ভবরোগবৈদ্যের শ্রীচরণ ভক্তের মস্তকে আর ভক্তের নয়নদ্বয় আনন্দাশ্রুপ্লাবিত। ভক্ত-পাঠকের মানসলোক সে-দৃশ্য অবলোকনে ধন্য, কৃতকৃতার্থ।

কৃপার কথা কি বলে শেষ হয়? সবাই যখন তাঁর মধুর কথা শ্রবণে প্রাণ-মন একাগ্র করে আছেন, তখন একজন হয়তো নিদ্রাতুর। তা দেখে কেউ বিদ্রূপ করেছে, কেউ অবাক হয়েছে। ভক্তবৎসল ভগবান গভীর স্নেহমাখা স্বরে জানিয়েছেন, ''তোরা কি বুঝবি রে? এ মায়ের ক্ষেত্র, শান্তিক্ষেত্র। ওরা এখানে এসে বিষয় কথা না বলে ঘুমোচ্ছে সে ভালো। তবু একটু শান্তি পাচ্ছে।''

আমরা হতভাগা হয়েও ভাগ্যবান। যেভাবে পাশ্চাত্যের ভোগবিলাস, তাদের বস্তুবাদ আমাদের সর্বস্ব গ্রাস করে নিচ্ছে, সেখানে বছরের প্রথম দিনটি প্রভু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাঁকে স্মরণ-মননের জন্য। সেদিন এক বিপুল সংখ্যক মানুষ আর পাঁচটি ছুটির দিনের মতো না কাটিয়ে ভোর রাত থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন কাশীপুরের রাস্তায়! অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রিয়দর্শন, ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা, সহাস্যবদন শ্রীরামকৃষ্ণ যে তৃষিত নয়নে দাঁড়িয়ে আছেন ঈশ্বরবিমুখতাজনিত বিস্মৃতিতে সর্বহারা আমাদের চৈতন্য করাবেন বলে! ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০৮), অখণ্ড
২। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), অখণ্ড